পর্যায়—৩

গণতান্ত্রিক প্রশাসন ও সুশাসন

একক-১ ☐ সুশাসন : অর্থ ও উদ্দেশ্য
একক-২ ☐ জনপ্রশাসনে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা
একক-৩ ☐ বিকেন্দ্রীকরণ, ক্ষমতা হস্তান্তর ও উন্নয়ন
একক-৪ ☐ ভারতীয় প্রেক্ষিতে সুশাসন

একক-১ ❑ সুশাসন : অর্থ ও উদ্দেশ্য

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ ভূমিকা
১.৩ সুশাসনের পটভূমি
১.৪ সুশাসনের অর্থ ও উদ্দেশ্য
১.৫ সুশাসন ও সুশীল সমাজ
১.৬ সুশাসনের মূল্যায়ন
১.৭ সারসংক্ষেপ
১.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী
১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা হবে :

- কোন ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে সুশাসনের ধারণা গড়ে ওঠে?
- সুশাসন বলতে আমরা কী বুঝি?
- সুশাসনের নানা সংজ্ঞা
- সুশাসনের বিবিধ বৈশিষ্ট্য
- সুশাসনের মাধ্যমে আমরা কী উদ্দেশ্য সাধন করতে পারি?
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সুশীল সমাজের কী ভূমিকা?
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে উদ্ভূত সমস্যাদি।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের ভূমিকা।

১.২ ভূমিকা

জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে কতগুলি শব্দ—সরকার, প্রশাসন ও শাসন—আমাদের কাছে অতি পরিচিত শব্দ। শব্দগুলি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত; তবে, তারা সমার্থক নয়। শব্দগুলির অর্থের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আলোচনার শুরুতেই এই বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া প্রয়োজন।

জনপ্রশাসনের সনাতন ধারণার উদ্ভব ঘটে উনিশ শতকে। তার আগে পর্যন্ত সরকার ও প্রশাসন সম্পর্কে আলোচনা কোন পৃথক ক্ষেত্র হিসাবে স্বীকৃত ছিল না। সে আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৮৭ সালে উড্‌রো উইলসনের বিখ্যাত নিবন্ধ *The Study of Administration* প্রকাশিত হয়। নিবন্ধে তিনি জনপ্রশাসনকে রাজনীতি থেকে পৃথক বিষয় হিসাবে আলোচনার দাবী রাখেন। তাঁর বক্তব্য ১৯০০ সালে প্রকাশিত ফ্র্যাঙ্ক গুড্‌নাউ-এর বই *Politics and Administration*-এ সমর্থন পায়। ক্রমেই জনপ্রশাসনের পৃথক অস্তিত্বের দাবী স্বীকৃতি লাভ করে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই জনপ্রশাসন নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এই সময়ে দুটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য লেখা ফ্রেডারিক্ উইনস্‌লো টেলর-এর *Principles of Scientific Management* (১৯১১) ও অঁরি ফেয়ল-এর *General and Industrial Management* (১৯১৬) প্রকাশিত হয়। লেখা দুটি সংগঠনের দক্ষতা ও প্রশাসনের বিশ্বজনীন নীতির আবিষ্কার ও প্রয়োগের উপর জোর দেয়। ১৯২৬-এ লিওনার্ড ডি ওয়াইট-এর *Introduction to the Study of Public Administration* প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি রাজনীতি প্রশাসনের বিভেদকে আরো সুস্পষ্ট রূপ দেয়। পরবর্তী কয়েক দশক ধরে নানা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে জনপ্রশাসনের বিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯৩৭-এ লুথার গুলিক্ ও লিন্ডাল্ উর্‌উইক্ Papers on the Science of Administration-এ POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting) প্রশাসনিক নীতিগুলি উত্থাপন করেন। এঁদের অবদানকে ধ্রুপদী ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়।

ধ্রুপদী ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব জনপ্রশাসনে অত্যন্ত প্রভাবশালী তত্ত্ব হলেও তা সমালোচনার উর্ধ্বে ছিল না। সংগঠনের আনুষ্ঠানিক কাঠামোর উপর গুরুত্ব আরোপ করায় ও যান্ত্রিকভাবে নীতি প্রয়োগ করায় ১৯৩০-এর দশকের সময় থেকেই সমালোচনা আসে মানবিক সম্পর্ক তত্ত্বের তাত্ত্বিকদের দিক থেকে। মানবিক সম্পর্ক তত্ত্ব গড়ে তোলার পিছনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন মার্কিন তাত্ত্বিক এল্টন্ মেয়ো ও তাঁর সহযোগী গবেষকরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের কাছে Western Electric Company-র Hawthorne Plant-এ ১৯২৪—১৯৩৩-এর গবেষণালব্ধ ফলের ভিত্তিতে তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁরা প্রাতিষ্ঠানিকতাকে বর্জন করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং অ-আনুষ্ঠানিক কাজের ধারার বিশ্লেষণের উপর জোর দেন। এই তত্ত্ব মানুষের উপর গুরুত্ব প্রদান করে এবং তার মনস্তাত্ত্বিক তাগিদ ও অ-আনুষ্ঠানিক গোষ্ঠী সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দেয়। এই তত্ত্ব ক্রমেই জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এক অর্থে পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা প্রভাবশালী আচরণবাদী তত্ত্বের পূর্বসূরি বলা যেতে পারে।

১৯৪৭-এ হার্বার্ট সাইমনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *Administrative Behaviour* প্রকাশিত হয়। সাইমন আচরণবাদী তত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা। তিনি তাঁর গ্রন্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা Decision-making-এর উপর গুরুত্ব দেন। তাঁর রচনায় রাজনীতি-প্রশাসন বিভাজনের ধারণাটি পরিত্যক্ত হয়।

ষাটের দশক ছিল বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক আলোড়নের দশক। ভিয়েৎনাম যুদ্ধ সহ নানা রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষিতে ইউরোপ ও আমেরিকা প্রতিবাদী আন্দোলনে উত্তাল হয়। সেই পটভূমিতেই ১৯৬৮-র মিনোব্রুক্ সম্মেলন থেকে New Public Administration-এর জন্ম হয়। এই আন্দোলন গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন ডুয়াইট্ ওয়াল্‌ডো-র নেতৃত্বে একদল তরুণ সমাজবিজ্ঞানী। মিনোব্রুক্ সম্মেলনের আলোচনার

বক্তব্য ১৯৭১-এ *Toward A New Public Administration:The Minnowbrook Perspective* গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়। চিরাচরিত বিষয়ের আলোচনার পাশাপাশি আলোচনায় গুরুত্ব পায় প্রশাসনের নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ব্যক্তির সঙ্গে আমলাতন্ত্রের সম্পর্ক ইত্যাদি নতুন বিষয়। New Public Administration বা নব জনপ্রশাসন মূলতঃ প্রাসঙ্গিকতা, অংশগ্রহণ, বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রতিনিধিত্বমূলক আমলাতন্ত্রের কথা বলে।

১৯৭০-এ উইলিয়াম্ নিস্কানেন্ (১৯৭১) ও ভিন্সেন্ট অস্ট্রম্-এর (১৯৭৪) হাত ধরে উঠে আসে Public Choice Theory বা জন পছন্দ তত্ত্ব। এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণ মনে করেন ক্রমোচ্চ আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন মানবিক ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণ ব্যক্তিকে সামাজিক বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখেন। মানুষ যুক্তিবাদী প্রাণী হওয়ায় তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে কাজ করে। ফলে ব্যক্তির পছন্দকেই দেখতে হবে সামাজিক সংগঠনের নির্ধারক হিসাবে এমনটাই মনে করেন এই তাত্ত্বিকরা। তাঁরা জনপ্রশাসন ও জননীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনসংস্থা এমনকি সরকারে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে প্রতিযোগিতা আনার কথা বলেন। বলাবাহুল্য, দৃষ্টিভঙ্গিটি বাজারমুখী এবং সামাজিক কল্যাণমূলক ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচনের পক্ষে। নীতিগত দিক থেকে এটি নয়া-উদারনৈতিক রাষ্ট্র দর্শনের কাছাকাছি।

১৯৮০-৯০-এর দশকে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক মনিটারি ফান্ড 'Governance'-এর ধারণাকে সামনে আনে। উদ্দেশ্য, পৌর সমাজ, এন.জি.ও. ও অসরকারী সংস্থাদের জননীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করা। Governance শব্দটি এই বিশেষ অর্থে ১৯৮৯-এ বিশ্ব ব্যাঙ্ক তার একটি প্রতিবেদনে ব্যবহার করে। আফ্রিকা মহাদেশের সাহারা-সংলগ্ন এলাকার সামগ্রিক অনগ্রসরতা বোঝাতে সেখানের 'Bad Governance'-কে দায়ী করা হয়।

১.৩ সুশাসনের পটভূমি

বর্তমান প্রেক্ষিতে সুশাসনের ধারণা বিশ্লেষণ করতে হলে বিশ্বায়নের পটভূমিতে তা করা প্রয়োজন। আশির দশক থেকেই জনপ্রশাসনে অনেক নতুন চিন্তা-ভাবনাকে উঠে আসতে দেখা যায়। সে চিন্তাভাবনার অনেকটাই ছিল রাষ্ট্র সম্পর্কে সমালোচনামূলক। তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রায়শই রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতার উপর জোর দেওয়া হয়। একদিকে যেমন আর্থিক অ-ব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্রকে দায়ী করা হয়, অপর দিকে তেমনই বাজার ও সুশীল সমাজের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মূল প্রতিপাদ্য হল রাষ্ট্র বা সরকারের ভূমিকা হ্রাস করা। জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে যে নতুন চিন্তা দেখা দেয় তার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় ১৯৮০-র দশকের নতুন অর্থনৈতিক চিন্তার মধ্যে। জনপ্রশাসনের সনাতনী চিন্তাগুলিকে অতিক্রম করে উঠে আসে নয়া উদারনীতিবাদী তাত্ত্বিক ও জনপছন্দ তাত্ত্বিকদের বক্তব্য। বিশ্বায়নের অর্থনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই চিন্তা ধারার উদ্ভব ঘটে।

১৯৮০ দশক থেকে আমরা দেখতে পাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ইতালি, স্পেন, সুইডেন প্রভৃতি দেশে নিউ রাইট-এর উত্থান ঘটে। তাদের প্রভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতাকে সংকুচিত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। গুরুত্ব দেওয়া হয়, বেসরকারী প্রশাসন, বেসরকারী ব্যবস্থাপন ইত্যাদিকে। জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাভাবনা উঠে আসতে থাকে। তারই হাত ধরে উঠে আসে Good Governance বা সুশাসনের ধারণা।

১.৪ সুশাসনের অর্থ ও উদ্দেশ্য

জনপ্রশাসনের সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনায় শাসন বা Governance-এর ধারণাটা বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। আগে, সনাতন জনপ্রশাসনে সরকারের সাংগঠনিক কাঠামো, সরকারের নীতি, আমলাতন্ত্র ও সিদ্ধান্তগ্রহণ-এর উপরই প্রধানতঃ আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকতো। প্রশাসনের কাজ বা Governance সেই তুলনায় কম আলোচিত হ'ত। আজ 'সরকারকেন্দ্রিক' আলোচনা থেকে আমরা 'প্রশাসনের ক্রিয়ার' দিকে ফিরে তাকাচ্ছি।

Oxford English Dictionary-তে আলাদাভাবে Governance শব্দটি অন্তর্ভুক্ত আছে। সেখানে সেটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয় 'The action or manner of governing' হিসাবে। অর্থাৎ, সেটি 'শাসনের ক্রিয়া বা পদ্ধতি'র দিকে ইঙ্গিত করে। *Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language* অনুসারে Governance হল 'Method or system of government or management'। যার অর্থ দাঁড়ায়, শাসন 'সরকার বা ব্যবস্থাপনের প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা'। সব মিলিয়ে স্পষ্টতই বোঝা যায়, সরকার ও শাসনের ধারণা সমার্থক নয়। শাসনের ধারণায় একটি ক্রিয়াগত ও নীতিগত মানদণ্ড লক্ষ্য করা যায়।

১৯৯২-এ প্রকাশিত Governance and Development নামক তার নথিতে বিশ্বব্যাঙ্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে প্রক্রিয়ায় একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা করা হয় তাকেই Governance হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে। বলা যেতে পারে, Governance-এর লক্ষ্য হল একটি অ-সফল ব্যবস্থাপনাকে পরিবর্তন করে সুষ্ঠ সামাজিক পুনর্গঠন করা। Governance শুধু সরকারের ক্রিয়া নয়। Governance বহু নায়ক বা Plurality of actors-এর অস্তিত্বকে স্বীকার করে। নাগরিকের দাবী ও ইচ্ছাপূণের লক্ষ্যে Governance সরকার, সুশীল সমাজ ও বাজারের সাহায্য নেয়।

Garry Stoker, *International Social Science Journal*-এর মার্চ ১৯৯৮-এ তার "Governance as Theory : Five Propositions" শীর্ষক নিবন্ধে Governance-এর যে পাঁচটি দিকের উপর আলোকপাত করেন সেগুলি হল :

(১) Governance-এর ধারণার কিছুটা সরকারী হলেও তার অনেক কিছুই সরকার বহির্ভূত।

(২) সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে Governance কাজ ও দায়িত্বের সীমারেখা বিভাজনকে অস্বীকার করে।

(৩) যৌথ কাজে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার সম্পর্ককে Governance চিহ্নিত করে।

(৪) স্বাধিকারপ্রাপ্ত স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা সম্পর্কে Governance আলোচনা করে।

(৫) Governance-এর ধারণা অনুসারে কেবলমাত্র সরকারী নির্দেশ ও ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে সব কাজ করা সম্ভব নয়।

Governance বা শাসনের ধারণায় চারটি প্রধান উপাদানের কথা বলা হয়। সেগুলি হল—

(১) দায়বদ্ধতা বা accountability

(২) স্বচ্ছতা বা transparency

(৩) নিশ্চয়তা বা certainty

(৪) অংশগ্রহণ বা participation

এগুলির উপর সুশাসন নির্ভরশীল।

(১) **দায়বদ্ধতা :** সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির জনগণের কাছে তাদের কাজকর্মের জন্য দায়বদ্ধ থাকা প্রয়োজন। একমাত্র Rule of Law বা আইনের শাসন থাকলেই তা সম্ভব।

(২) **স্বচ্ছতা :** কি পদ্ধতিতে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তা জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন। সব কিছুই আইন মেনে হওয়া দরকার। স্বচ্ছতার ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে তথ্য জানার অধিকার। স্বচ্ছতার জন্য সঠিক তথ্য যাতে সহজে পাওয়া যায় সেদিকে চোখ রাখা দরকার।

(৩) **নিশ্চয়তা :** নিশ্চয়তা হল উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা বা বিচার ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল থাকতে পারার মতো পরিস্থিতি থাকা।

(৪) **অংশগ্রহণ :** সুশাসনের মূল স্তম্ভ হল জনগণের অংশগ্রহণ। এই অংশগ্রহণের সাফল্য সঠিক তথ্যের আদানপ্রদানের উপর নির্ভরশীল। বাক্ স্বাধীনতা, সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা ও সুসংগঠিত সুশীল সমাজ থাকা প্রয়োজন। এই অংশগ্রহণের মাধ্যমেই জনগণ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে, আর এর মাধ্যমেই জনগণ জনসম্পদের ব্যবহার ও সরকারী কাজকর্মের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তর্গত United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific সুশাসন বা Good Governance-এর আটটি উপাদান চিহ্নিত করে। সেগুলি হল—অংশগ্রহণ (Participation), ঐক্যমত (concensus), আইনের শাসন (rule of law), দায়বদ্ধতা (accountability), স্বচ্ছতা (transparency), সংবেদনশীলতা (responsiveness), কার্যকারিতা ও দক্ষতা (effectiveness) এবং সমদর্শিতা ও পরিবেষ্ঠনতা (equity and inclusiveness)।

১.৫ সুশাসন ও সুশীল সমাজ

১৯৯০-এর দশক থেকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতে নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে আছে Right to Information Act বা তথ্যের অধিকার আইন, Consumer Protection Legislation বা উপভোক্তা নিরাপত্তা বিষয়ক আইন, Citizens' Charter, Whistleblower Protection, e-Governance, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, Public Interest Litigation ইত্যাদি। বর্তমানে দেখা যায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অনেকখানি চাপই আসে সুশীল সমাজের দিক থেকে। উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা যায়, লোকসত্ত্বা-র কথা। হায়দরাবাদ-কেন্দ্রীক এই সামাজিক সংগঠন লক্ষাধিক গ্রামবাসীর স্বাক্ষর সম্বলিত একটি পিটিশন সরকারের কাছে জমা করে। পিটিশনে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা বাড়ানোর দাবী রাখা হয়।

সুশাসন বজায় রাখার ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের নানাবিধ অবদান আছে।

(১) ¢Ÿ#be¢›y Watchdog বা পাহারাদারের ভূমিকা পালন করে। কোথায় Governance-এর ঘাটতি দেখা গেল বা কোথায় মানবাধিকার লঙ্ঘিত হল সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখে ও প্রতিবাদ সংগঠিত করে।

(২) সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মুখপত্র হিসাবে কাজ করে।

(৩) বিক্ষুব্ধ নাগরিকদের অধিকারের লড়াইতে আন্দোলনকারীর ভূমিকা পালন করে।

(৪) শিক্ষাদাতার ভূমিকা পালন করে। একদিকে যেমন নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলায় সুশীল সমাজের বড় ভূমিকা আছে, অপর দিকে সরকারকে বাস্তব পরিস্থিতি ও জনমত সম্পর্কে সচেতন করার কাজও সুশীল সমাজ পালন করে।

(৫) সুশীল সমাজ নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিষেবা দানেরও ব্যবস্থা করে। বিশেষতঃ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এবং সেই মানুষদের মধ্যে যেখানে সরকারের সাহায্য যথাযথ ভাবে পৌঁছোয় না।

(৬) সংগঠকের কাজ সুশীল সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সুশীল সমাজ নানা ক্ষেত্রে জনমত সংগঠিত করে কখনও তা করে ভাল নীতির পক্ষে, কখনও বা খারাপ নীতির বিপক্ষে। কখন তাদের দেখা যায় শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, টীকাকরণ ও পরিবেশ সুরক্ষায় সরকারী প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় জনমত সংগঠিত করতে।

(৭) যে পরিষেবা দানের ক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টা তাদের অ-নমনীয়তার জন্য সীমিত সাফল্য অর্জন করতে পারে, সেখানে অনেক বেশি নমনীয় অবস্থান থাকায় সুশীল সমাজকে সক্রিয় সহযোগিতা করতে দেখা যায়।

সুশীল সমাজ সংগঠন সমূহ নানা নামে পরিচিত। যথা, Voluntary Organization (VO), Non-governmental Organization (NGO), Civil Society Organization (CSO) ইত্যাদি। এই ধরনের সংগঠন নানা রকমের হওয়ায় তাদের কর্ম-পদ্ধতি; দক্ষতা সবই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। কতগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল—সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে; আবার কিছু সংগঠন তুলনামূলকভাবে অ-সফল, সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের অবদান নেই বললেই চলে। সুশাসনের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রভাব ফেলতে গেলে এই সংগঠনগুলিকে নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করতে হয়, যোগ্য নেতৃত্ব থাকা প্রয়োজন, আর প্রয়োজন দায়বদ্ধতা, তৃণমূল স্তরে কাজের অভিজ্ঞতা, স্বচ্ছতা ও আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র।

সুশীল সমাজ সংগঠনগুলিকে প্রায়শই কিছু দুর্বলতার শিকার হতে দেখা যায়। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কর্মী ও সম্পদের অভাব, অর্থনৈতিক সমস্যা, আর্থিক সহায়কের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা, যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, দুর্নীতি, ইত্যাদি।

সুশীল সমাজ শক্তিশালী ও উপযুক্ত হলে তবেই তা সুশাসনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

১.৬ সুশাসনের মূল্যায়ন

যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন, দেশে দেশে সুশাসনের ধারণার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তার অর্থ অনেকটাই নির্ভর করে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান, সরকারের কাঠামো, সামাজিক ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উপর। এ ছাড়াও আছে রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রভাব। ফলে, কোন একটি দেশে যা স্বাভাবিক মনে করা যেতে পারে অন্য দেশে তা নাও হতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দুর্নীতি অত্যন্ত ব্যাপক হওয়ায় সুশাসনের ধারণাটি অনেকাংশেই জনসাধারণের তত্ত্বগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। দুর্নীতি এমনভাবে রাজনৈতিক নেতা ও আমলাদের মধ্যে তার শিকড় বিস্তার করেছে যাতে তা প্রায় রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে।

অনেক উন্নয়নশীল দেশেই Rule of Law বা আইনের শাসনের অভাব লক্ষণীয়। এর ফলে সমাজে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে যারা ক্ষমতাসম্পন্ন তারা কোন অসুবিধায় পড়েন না, কিন্তু দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষ সমস্যার সম্মুখীন হন। কোন দেশে আইনের শাসন না থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হয় না।

বর্তমানের চিন্তাভাবনায় নাগরিকদের উপভোক্তা হিসাবে গণ্য করা হয়। সে ক্ষেত্রে সুশাসনের অর্থ হওয়া উচিত এই উপভোক্তাদের জনপরিষেবার সুবিধা যথাযথ ভাবে পৌঁছে দেওয়া। অথচ বাস্তবে দেখা যায় ক্ষমতাসীন দল, বিরোধী পক্ষ ও আমলারা কেউই সে বিষয়ে তৎপর নয়। করদাতা ও অবদমিত জনসাধারণের কাছে পরিষেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে স্পষ্টতই অনীহা দেখা যায়।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক বেসরকারী সংস্থা সমূহকে উৎসাহিত করার পক্ষে ও তাদের অবাধ বিস্তারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অন্ততঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে অনেকটাই রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করতে হবে। বেসরকারী সংস্থাগুলির জনগণের প্রতি প্রয়োজনীয় দায়বদ্ধতা থাকে না, মুনাফার হিসাবই তাদের কাজের প্রধান নির্ণায়ক। রাষ্ট্রই একমাত্র নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে প্রয়োজনীয় পরিষেবা আম-জনতার মধ্যে পৌঁছে দিতে পারে।

অথচ, রাষ্ট্রই আবার অনেক সীমাবদ্ধতার মাঝে কাজ করতে বাধ্য থাকে। এগুলির মধ্যে দেশের বাইরে এবং ভিতরের নানা ধরনের চাপ থাকে। তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আছে, বিভিন্ন চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর টানাপোড়েন। অনেকক্ষেত্রে ধর্মীয় মৌলবাদও সুশাসনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

১.৭ সারসংক্ষেপ

১৮৮৭ সাল থেকে একটি বৌদ্ধিক বিষয় হিসাবে উঠে আসা জনপ্রশাসন সময়ের সাথে সাথে নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। বিশ্বের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে তা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকেছে।

১৯৯০-এর দশক থেকে বিশ্বের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এককথায় যাকে বিশ্বায়ন নামে আখ্যা দেওয়া হয়। এই পরিবর্তন আসার কিছুকাল আগে থেকেই বৌদ্ধিক স্তরে তার সপক্ষে নানা ধরনের মতামত উঠে আসতে থাকে। উঠে আসে জনপছন্দ তত্ত্ব। সেই চিন্তা ভাবনার পথ বেয়ে জনপ্রশাসনকে আমরা দেখি ‘প্রশাসন’ থেকে ‘শাসন’-এর ধারণার দিকে অগ্রসর হ’তে; সেখান থেকে আসে সুশাসনের চিন্তা। ক্রমেই সুশাসনের বা Good Governance-এর দাবীকে আমরা জোরালো হয়ে উঠতে দেখি।

এতে শুধু সরকার নয়, সরকারের পাশাপাশি অ-সরকারী সংস্থা ও সুশীল সমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে গণ্য হয়। তবে, নানা জটিলতা ও সমস্যাও থেকে যায়; তাদের সুষ্ঠু মোকাবিলার মধ্যে দিয়েই সুশাসন এগোতে পারে।

১.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) সুশাসনের ধারণা বিশ্লেষণ করুন।

(২) সুশীল সমাজ ও সুশাসনের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

(৩) সুশাসনের ধারণার সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) সুশাসনের ধারণার উৎপত্তি আলোচনা করুন।

(২) 'Administration' ও 'Governance'-এর পার্থক্য কী?

(৩) সুশাসনের ধারণার মূল বক্তব্য কী?

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) সুশাসন বজায় রাখার ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের অবদান সংক্ষেপে লিখুন।

(২) সুশাসনের চারটি উদ্দেশ্য লিখুন।

(৩) Garry Stoker তাঁর Governance as Theory : Five Propositions নিবন্ধে কোন পাঁচটি দিকের উল্লেখ করেছেন?

১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

S. K. Das, *Civil Service Reform and Structural Adjustment*, Oxford University Press, 1998.

D. Osborne and T. Gaebler, *Reinventing Government*, Prentice Hall, New Delhi, 1992.

T. N. Chaturvedi (ed.), *Towards Good Governance*, New Delhi, IIPA, 1998.

World Bank, *Governance and Development*, Washington D. C. 1992.

রাজশ্রী বসু, *জনপ্রশাসন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০৫

Garry Stoker, "Governance as Theory : Five Propositions", *International Social Science Journal*, No. 155, March. 1998.

Indian Journal of Public Administration, July-Sept. 1998. (Special Number on Good Governance)

একক-২ ❑ প্রশাসনে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ ভূমিকা
২.৩ দায়বদ্ধতার নানা রূপ
২.৪ উন্নয়নশীল দেশে দায়বদ্ধতা
২.৫ স্বচ্ছতা
২.৬ তথ্যের অধিকার
২.৭ সুশাসন ও স্বচ্ছতা
২.৮ সারসংক্ষেপ
২.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী
২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল—

- প্রশাসনে দায়বদ্ধতা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা।
- দায়বদ্ধতার নানা রূপ বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদান করা।
- উন্নয়নশীল দেশে প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।
- তথ্যের অধিকার বিষয়ে একটি সাধারণ ধারণা প্রদান করা।
- সুশাসন ও স্বচ্ছতার সম্পর্ক অনুধাবনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

২.২ ভূমিকা

অতীতের রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ ছিল না, বা থাকলেও ছিল সীমিত। জনগণ শাসিত হত এবং শাসকের দেওয়া নির্দেশ পালন করতো। কিন্তু গণতান্ত্রিক চেতনার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ অনেক বেশি দেখা যায়। শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণের সক্রিয় অংশীদারিত্বের দাবী ওঠে। জনগণের শাসন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে উঠে আসে তার সঠিক তথ্য পাওয়ার অধিকারের প্রশ্ন; কারণ, সেই তথ্যের উপর নির্ভর করেই কেবলমাত্র যথাযথ অংশগ্রহণ সম্ভব।

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যে ক্রমেই স্পষ্ট হয় যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ শুধু শাসিত হবেন তা নয়, তাদের যথার্থ ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশগ্রহণের নানা দিক বৌদ্ধিক ও বাস্তব ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করে। জনগণ যে একাধারে করদাতা ও জনপরিসেবার উপভোক্তা তা উপলব্ধ হয়। জনগণ, তথা নাগরিককে কেন্দ্রে রেখে উন্নয়নের ধারণা ব্যক্ত হয়।

২.৩ দায়বদ্ধতার নানা রূপ

জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার ধারণা প্রথমতঃ ইংল্যান্ডে উঠে আসে, সামন্ত ব্যবস্থার অবক্ষয়ের পটভূমিতে। যখন সামন্ত ব্যবস্থার অবক্ষয়ের পাশাপাশি নতুন বাণিজ্যিক শ্রেণীর উত্থান দেখা যায়, রাজা সেই শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুনাফার অংশ দাবী করেন। অপর দিকে সেই বাণিজ্যিক শ্রেণী তাদের কষ্টার্জিত মুনাফার ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায়। দায়বদ্ধতার ধারণাটি আরো পরিমার্জিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের গৃহ যুদ্ধের সময়ে। রাজা দ্বিতীয় চার্লস্-এর শাসনকালে তা শাসনের একটি মৌলিক নীতি হিসাবে উঠে আসে। আধুনিক উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক চেতনার উদ্ভবের সাথে সাথে ধারণাটি আরও পরিমার্জিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

মনে করা হয়, ইংরাজি ভাষায় 'accountable' শব্দটি প্রথম ১৫৮৩ সালে ব্যবহৃত হয় এবং তা অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে। আজ অবশ্য শব্দটির বিস্তার আরো ব্যাপক এবং সরকারের সমস্ত কাজকর্মের প্রেক্ষিতে ব্যবহৃত। *Shorter Oxford English Dictionary* মোতাবেক, 'accountable' হল 'liable to be called to account'। আবার, *Webster's New International Dictionary of the English Language* প্রায় একইভাবে বলে 'Liable to be called on to render an account'।

দায়বদ্ধতার মূলতঃ দুটি দিক আছে, একটি রাজনৈতিক অপরটি প্রশাসনিক। এই দুটো দিক স্বতন্ত্রও বটে, আবার যুক্তও বটে। পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় নানা পদ্ধতির মাধ্যমে পার্লামেন্ট প্রশাসনকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য রাখে। পার্লামেন্টের মাধ্যমে এই দায়বদ্ধতা থাকে জনগণের কাছে। এটি রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা। এছাড়া দেখা যায় প্রশাসনিক শীর্ষ কর্তা তথা মন্ত্রীর কাছে আমলারা দায়বদ্ধ থাকে। এটি হল প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা। এই দুই ধরনের দায়বদ্ধতা একে অপরের পরিপূরক।

রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা

বর্তমানকালে মনে করা হয় কোন বিশেষ আমলাকে তাঁর কাজের জন্য দায়বদ্ধ রাখতে হলে মন্ত্রীকে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এর কারণ হল, মন্ত্রীর অনুমোদন ছাড়া আমলার পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিকভাবে আমলা সরাসরিভাবে জনসাধারণের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন না। যদিও তাঁরা তাঁদের বিশেষ জ্ঞানের সুবাদে সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করেন কিন্তু জনগণের চোখে পরিচয়হীন থেকে যান।

সংসদের কাছে দায়বদ্ধতা

সংসদ নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশাসনের উপর তার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। সাংসদদের প্রশাসন সংক্রান্ত কোন জিজ্ঞাসা থাকলে সংসদে সেই দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে তা জানতে চাইতে পারেন। মনে রাখা প্রয়োজন, আমলারা নীতি রূপায়ণের সাথে যুক্ত থাকলেও সংসদের কাছে তাদের কোন সরাসরি দায়বদ্ধতা থাকে না। তাদের বদলে প্রশ্নের

সম্মুখীন হন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা। সংসদীয় নানা কমিটির মাধ্যমে সংসদ প্রশাসনিক নানা দিক সম্পর্কে অনুসন্ধান চালায়। প্রয়োজন হলে দপ্তর থেকে তথ্য চেয়ে পাঠায়। আমলাদের সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে হয়।

সংসদের হাতে প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার অন্যতম উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হল অর্থনৈতিক হাতিয়ার। সরকারের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকে সংসদের হাতে। সরকারের Budget প্রস্তাব সংসদে পাস হওয়া আবশ্যক। সংসদে বাজেটের (Budget) উপর বিতর্ক হয়, সরকারের প্রস্তাবের সমালোচনা ওঠে এবং সংসদ তা বাতিল বা সংশোধন করতে পারে। যদিও এটা সচরাচর ঘটে না, তবে তাত্ত্বিক দিক থেকে বললে বলা যায়, এটা সম্ভব।

সরকারের অর্থ ব্যয়ের পর তা অডিট্ হয়। শীর্ষ অডিটরের রিপোর্ট সংসদের সামনে পেশ হয়। সংসদ সেই রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে দেখে যে যাতে অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল তা সেই উদ্দেশ্যেই যথাযথ ভাবে ব্যয় হয়েছে কিনা এবং ব্যয় প্রক্রিয়ায় আইন কানুন যথাযথ ভাবে মান্য করা হয়েছে কিনা।

বিচার বিভাগের কাছে দায়বদ্ধতা

অনেক উদারনৈতিক দেশেই, দেশের শীর্ষ আদালতের কাছে প্রশাসন ও আইনসভা দায়বদ্ধ থাকে। ব্রিটেন ও ভারত তার উদাহরণ। আদালত প্রশাসন বা আইনসভার বিভিন্ন কাজের সমালোচনায় রিট জারি করতে পারে।

পৌর সমাজের কাছে দায়বদ্ধতা

আধুনিককালে পৌর সমাজ অনেকটাই সক্রিয়ভাবে প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা চালায়। নীতি নির্ধারণের দিকনির্দেশ থেকে শুরু করে নীতি রূপায়ণের নানা দিকের উপর গণতান্ত্রিক দেশে পৌরসমাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। নিজেদের অবস্থানের সপক্ষে জনমত সংগঠিত করার নানা পদ্ধতি ব্যবহার করে। মিটিং, মিছিল, সভা, সমিতি, গণ-স্বাক্ষরের পাশাপাশি আধুনিক প্রচার মাধ্যমকে হাতিয়ার করে। প্রসঙ্গতঃ, মনে রাখা প্রয়োজন আধুনিককালে গণমাধ্যম অত্যন্ত শক্তিশালী। এই শক্তির অনেকটাই নতুন তথ্য প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। উচ্চমানের ক্যামেরা ও ইলেকট্রনিক তথ্য মাধ্যম তথ্যের আদান প্রদানকে অনেক প্রভাবশালী ও সহজ করে দিয়েছে। অনেক স্পষ্টভাবে উচ্চমানের ছবি সহকারে জনসাধারণের কাছে কোন ঘটনার বিবরণ আজ অনেক সহজে পৌঁছে যায়—অতি অবশ্যই জনমত গঠনে তার প্রভাব ফেলে। বলা বাহুল্য, প্রচার মাধ্যমের গুরুত্ব সম্পর্কে গণতান্ত্রিক দেশগুলির সরকার ওয়াকিবহাল। তাই সরকারের তরফ থেকে নিয়মিত সংবাদমাধ্যমগুলির জন্য প্রেস্ বিবৃতি দেওয়া হয় বা প্রেস্ কনফারেন্স করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রেসের মাধ্যমে সরকার জনসাধারণকে তার দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে সচেতন করতে ও প্রভাবিত করতে সচেষ্ট থাকে। সংবাদমাধ্যম সরকারের পক্ষে থাকলে সরকারের পক্ষে নীতিগ্রহণ ও তা রূপায়ণ করা অনেক সহজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, সংবাদমাধ্যম সরকারের বিরুদ্ধে গেলে সেই প্রচার সরকারের ক্ষতি সাধন করতে পারে, এমনকি সরকারের পতনের কারণও হতে পারে।

কাঠামোগত দায়বদ্ধতা

ক্রমোচ্চ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কাঠামোগতভাবে দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া দেখা যায়। প্রশাসনিক ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে থাকা মন্ত্রীর কাছে তার অধীনস্ত আমলারা তাদের কার্যকলাপের জন্য দায়বদ্ধ থাকে। ক্রমোচ্চ ব্যবস্থার পাশাপাশি, শ্রম বিভাজন ও বিশেষীকরণ, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব ব্যবস্থা, শৃঙ্খলা, আদেশের ঐক্য, নিয়ন্ত্রণের ঐক্য, কর্তৃত্বের শৃঙ্খল, প্রভৃতি কাঠামোগত ভাবে দায়বদ্ধতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে।

অডিট্ ব্যবস্থা ও দায়বদ্ধতা

দায়বদ্ধতাকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাখতে Audit ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। সাংবিধানিক পদাধিকারী Comptroller and Auditor-General-এর নেতৃত্বে স্বতন্ত্র যে অডিট্ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে তা সরকারের আয় ব্যয়ের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। আয়-ব্যয় যথাযথভাবে আইনকানুন মেনে হয়েছে কিনা তার হিসাব করে।

২.৪ উন্নয়নশীল দেশে দায়বদ্ধতা

অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ-ই অতীতে কোন না কোন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশের অধীনস্থ ছিল। ফলে সেই দেশগুলির শাসন কাঠামোও সেই সাম্রাজ্যবাদী দেশের ধাঁচে গড়ে ওঠে। দায়বদ্ধতার ধারণাও সেই মতই তৈরি হয় পাশ্চাত্যের ধাঁচে। দেখা যায়, আমলারা কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে দায়বদ্ধ থাকে। তাও, সেই দায়বদ্ধতার নিয়ম নীতি খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত নয়। এর ফলে, আমলাদের উপর মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ কতটা থাকবে তা অনেকটাই নির্ভর করে বাস্তব পরিস্থিতির উপর, আমলা ও মন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের উপর। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা প্রয়োজন এই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আমলারা তাদের বিশেষ জ্ঞান ও যোগ্যতার জোরে, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। বাস্তবে, নানা দুর্বলতার কারণে আইনসভাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই প্রশাসনের উপর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে না; এটা বিশেষত দেখা যায় বাজেট আলোচনার ক্ষেত্রে। অর্থবহ আলোচনার জন্য প্রয়োজন তথ্য ও বিশেষ জ্ঞান, সাংসদদের মধ্যে এই দুটিরই ঘাটতি দেখা যায়। তাদের অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত নন, এমনকি কেউ কেউ আবার প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকেছেন। ফলে, নানা বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের তথ্যনির্ভর আলোচনা করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়। সংসদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রাপ্তির পরিকাঠামোও অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল। ফলে অনেক সময়ই আলোচনা হয় নিয়মমাফিক, উপর উপর।

উন্নয়নশীল দেশে গণমাধ্যম অনেকক্ষেত্রেই সরকার নিয়ন্ত্রিত। সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমের পক্ষে সরকারের সমালোচনা করা কঠিন হয়। যে গণমাধ্যম সরকার নিয়ন্ত্রিত নয়, তার আবার অন্য ধরনের দুর্বলতা থাকে। যেমন, আর্থিক দুর্বলতা বা তথ্য সংগ্রহ করতে পারার ক্ষেত্রে দুর্বলতা। ফলে উভয় প্রকারের গণমাধ্যমের ক্ষমতা সীমিত থেকে যায়।

আবার, তত্ত্বগত দিক থেকে বললে বলতে হয়, আমলারা মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় উন্নয়নশীল দেশে প্রায়শই মন্ত্রী ও আমলার মধ্যে নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে এক ধরনের অ-শুভ আঁতাত গড়ে ওঠে। বলাবাহুল্য, এর ফলে নাগরিকদের স্বার্থ ব্যাহত হয়।

গত শতকের আশির দশক থেকে জনপ্রশাসনে যে নতুন চিন্তাভাবনা উঠে আসে তার ফলে আমলা মন্ত্রী সম্পর্কের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গিও অনেকটা পরিবর্তিত হয়। সুশাসনের ধারণা গুরুত্ব পায় এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় স্বচ্ছতার আবশ্যিকতা।

২.৫ স্বচ্ছতা

সনাতন ওয়েবেরিয় দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারী কাজের ক্ষেত্রে গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দেওয়া হত। সরকারী ক্রিয়াকলাপকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা হত। ফাইল, নথি, চিঠি প্রভৃতিতে প্রায়শই উপরে ‘গোপনীয়’ শব্দটি লেখা থাকত। ধরেই নেওয়া হত তা জনগণের জানার কোন অধিকার নেই বা জনগণকে জানানোরও সরকারের কোন

দায়বদ্ধতা নেই। স্বচ্ছতার ধারণা এর ঠিক বিপরীত ধারণা। এর মূল অর্থ হল সরকারের নীতি ও ক্রিয়াকলাপকে জনসমক্ষে রাখা। *Oxford English Dictionary* অনুসারে, 'transparent' শব্দটির অর্থ হল—'frank, open, candid, ingenuous'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কিন্তু জনসাধারণের তথ্যের অধিকার ক্রমেই স্বীকৃত হতে থাকে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভা ১৯৪৬-এ তার প্রথম অধিবেশনে তথ্যের স্বাধীনতাকে একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে উল্লেখ করে। সেটি সম্পর্কে বলা হয় 'a fundamental human right and the touchstone of all the freedoms to which the UN is consecrated"। ১৯৪৮ সালে গৃহীত রাষ্ট্রপুঞ্জের Declaration of Human Rights-এ বলা হয়, "everyone shall have the right to seek, receive, impart information and ideas through the media regardless of frontiers"।

গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা ও সুশাসনের ধারণার সঙ্গে স্বচ্ছতার ধারণা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। গণতন্ত্রে নাগরিকদের সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে জানার ও নিয়ন্ত্রণ করার শুধু যে পূর্ণ অধিকার আছে তা-ই নয়, সে বিষয়ে তাদের দায়িত্বও আছে। এই অধিকার ভোগ করতে ও দায়িত্ব পালন করতে হলে সরকার কী করছে না করছে তা জানা আবশ্যক। আর, স্বচ্ছতা না থাকলে তা জানা সম্ভব নয়। অমর্ত্য সেন তার গ্রন্থ *Development as Freedom*-এ পাঁচ ধরনের স্বাধীনতার উল্লেখ করেন; তার মধ্যে তিনি স্বচ্ছতার স্বাধীনতার কথা বলেন।

২.৬ তথ্যের অধিকার

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার গুরুত্ব প্রসঙ্গে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। স্বচ্ছতার সঙ্গে তথ্যের অধিকারের প্রশ্নটি যুক্ত। সাম্প্রতিককালে নাগরিকদের তথ্যের অধিকার ক্রমেই গুরুত্ব পাচ্ছে। নাগরিক আজ কেবলমাত্র কিছু পরিষেবার উপভোক্তা নয়; সে সরকারের কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রকও, আর সেই হিসাবে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তার জন্য চাই তথ্য। জনপ্রশাসন যথাযথভাবে স্বচ্ছ না হলে কিন্তু আশানুরূপ তথ্য পাওয়াও সম্ভব হয় না। ফলে, তথ্য পাওয়া অনেকটাই প্রশাসনিক স্বচ্ছতার উপর নির্ভর করে। প্রশাসন যত বেশি স্বচ্ছ হবে, তথ্য দিতে তার তত কম আপত্তি থাকবে।

সাধারণতঃ দেখা যায়, যে দেশে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বেশি থাকে সেখানে দুর্নীতির সম্ভাবনাও বেশি থাকে। লোকচক্ষুর আড়ালে দুর্নীতি বেড়ে ওঠে। আর্থিক দুর্নীতি থেকে শুরু করে স্বজন পোষণ অনেক সহজে ঘটে। স্বচ্ছতা দুর্নীতি রোধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তথ্যের অধিকার স্বচ্ছতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তথ্য জানার অধিকারের মধ্য দিয়ে নাগরিকরা সরকারের নানা নীতি ও কাজকর্ম বিষয়ে খবর সংগ্রহ করতে পারে ও তা প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে বা জনসমক্ষে আনতে পারে।

তবে কোন প্রশাসনই সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পারে না। অথবা সব বিষয়ের উপর তথ্য দিতে পারে না। স্বচ্ছতার মধ্যেও কিছু বিষয় থাকে যা মনে করা হয় গোপন রাখা প্রয়োজন। বিষয়গুলির অধিকাংশই নিরাপত্তা সংক্রান্ত। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সেই সব তথ্য লোক সমক্ষে আনা হয় না। তবে বলাবাহুল্য, এই গোপনীয় তথ্যের অংশ যত কম রাখা যায় তত ভাল।

ভারতে ২০০৫ সালে তথ্যের অধিকার আইন সংসদে পাস হয়। এই আইন অনুসারে প্রত্যেক গণব্যক্তিত্ব তার সংস্থার কাজকর্ম, সিদ্ধান্ত, আয়-ব্যয়, কাঠামোগত তথ্য জনসমক্ষে রাখতে বাধ্য থাকে। এই আইন মোতাবেক যে

কোন তথ্য যা সংসদে পেস করা যায় তা থেকে নাগরিকদের বঞ্চিত করা যাবে না। এই আইন বলে কেন্দ্রীয় স্তরে থাকে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন। এই কমিশনের শীর্ষ স্থানে থাকেন প্রধান তথ্য কমিশনার। রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে থাকে রাজ্য তথ্য কমিশন যার শীর্ষে থাকেন রাজ্য প্রধান তথ্য কমিশনার। এই তথ্য কমিশনারদের পৌর আদালতের সমান ক্ষমতা থাকে। ২০০৫-এর আইন অনুযায়ী প্রতিটি সরকারী অফিসেই জন তথ্য আধিকারিকের নাম ঘোষিত হতে হয়। কেউ সেই সংস্থা থেকে তথ্য চাইলে তিনি তা সরবরাহ করবেন। এর জন্য যথাযথভাবে একটি ফি সহ দরখাস্ত করতে হয়। তিরিশ দিনের মধ্যে সেই দরখাস্ত হয় নাকচ হয় নতুবা তথ্য দিতে হয়।

তবে তথ্য পাওয়ার উপর কিছু সমীবদ্ধতা আছে। যেমন, দেশের নিরাপত্তা, জাতীয় সংহতি ও সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত তথ্য, ব্যক্তির নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য, বিদেশ নীতির ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্য বিষয়ক গোপনীয় তথ্য, প্রভৃতি তথ্যের দাবী অগ্রাহ্য হয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পৌর সমাজ ও গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো দুর্বল হওয়ায় প্রায়শই স্বচ্ছতার অভাব দেখা দেয়। অতীতের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার ঐতিহ্যও তার অন্যতম কারণ। দেখা যায়, আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার চারপাশে গোপনীয়তার এক বৃত্ত গড়ে তোলে। তথ্য সরবরাহ করার ব্যাপারে আমলাদের মধ্যে অনেক সময়ই তীব্র অনীহা দেখা যায়। তথ্যের দাবীকে তারা নিজেদের অবস্থানের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখে, এক ধরনের বিপন্নতা বোধ তাদের গ্রাস করে। অপর দিকে, জনগণের সংগঠিত ভাবে এগিয়ে এসে তথ্য দাবী করার পরিমণ্ডল এখনও দুর্বল। এই দুর্বলতার মূলে আছে আইনি জ্ঞানের অভাব, আর্থিক কারণ, পৌর সমাজের সার্বিক দুর্বলতা, ব্যাপক দূর্নীতি প্রভৃতি কারণ।

যারা এগিয়ে এসে তথ্য দাবী করে এবং তার ভিত্তিতে দূর্নীতি প্রভৃতি বিষয়ের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে তৎপরতা প্রদর্শন করে তাদের নিরাপত্তাও অনেক সময়ে বিপন্ন হয়। তাদের নিরাপত্তার জন্য আইনী পদক্ষেপ নেওয়াও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে, ২০১৪-য় Whistleblowers Protection Act সংসদে পাস হয়।

২.৭ সুশাসন ও স্বচ্ছতা

স্বচ্ছতা সুশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্বচ্ছতা আবশ্যক। কী পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে, কী সেই সিদ্ধান্ত এবং তার রূপায়ণ প্রক্রিয়া কী, তা জানা নাগরিকদের প্রয়োজন। তারই ভিত্তিতে সুশাসনের বিভিন্ন উপাদান সুরক্ষিত হওয়া সম্ভব। সুশাসন নাগরিকদের শাসন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ দাবী করে। পর্যাপ্ত ও সঠিক তথ্য ছাড়া যথাযথ অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। আবার, মনে রাখা দরকার যে স্বচ্ছতা ছাড়া তথ্য পাওয়াও সম্ভব নয়। যে প্রশাসন গোপনীয়তার উপর জোর দেয় সে প্রশাসন তথ্যের অধিকারকেও মানবে না। সেখানে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দূর্নীতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এ সবই সুশাসনের পরিপন্থী। সুশাসন সার্বিক উন্নয়নমুখী। সেই উন্নয়ন জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও দূর্নীতিমুক্ত রাজনীতি, প্রশাসন ও সমাজ দাবী করে। সে ক্ষেত্রে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা অপরিহার্য উপাদান।

২.৮ সারসংক্ষেপ

সাম্প্রতিককালে জনপ্রশাসনের নতুন চিন্তাভাবনার উদ্ভবের সাথে সাথে প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার ধারণা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিষয়গুলি নতুন না হলেও তা নতুন মাত্রা পেয়েছে। উন্নয়নের লক্ষ্যে

সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার যে তাগিদ আজ আমরা দেখি তার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার ধারণা আলোচিত হচ্ছে।

দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আইন-কানুন, আইনের শাসন, সজাগ নাগরিক ও সক্রিয় পৌর সমাজ আবশ্যক। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার পথে নানা ধরনের বাধা লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে আছে নাগরিক সমাজের দুর্বলতা থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক সমস্যা ও ব্যাপক দুর্নীতি। সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এসব কিছু অতিক্রম করার চেষ্টা অত্যন্ত জরুরী। এ প্রসঙ্গে, তথ্যের অধিকারের গুরুত্ব মনে রাখা দরকার। ভারতবর্ষে তা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে একাধিক আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে।

২.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) জনসাধারণের কাছে সরকারের দায়বদ্ধতার ধারণার বিবর্তন আলোচনা করুন।

(২) জনসাধারণের কাছে সরকারের দায়বদ্ধতার নানা দিক বিশ্লেষণ করুন।

(৩) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা বলতে কী বোঝেন?

(২) জনগণের কাছে সরকারের দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত করায় সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা সংক্ষেপে লিখুন।

(৩) স্বচ্ছতার সঙ্গে তথ্যের অধিকার কিভাবে সম্পর্কিত?

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) আমলারা তাদের কাজের জন্য কার কাছে দায়বদ্ধ থাকে?

(২) টীকা লিখুন—তথ্যের অধিকার

(৩) উন্নয়নশীল দেশে দায়বদ্ধতার প্রকৃতি লিখুন।

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

T. N. Chaturvedi (ed), *Administrative Accountability,* New Delhi : IIPA, 1984.

M. Bhattacharya, *Restructuring Public Administration : Essays in Rehabilitation*, New Delhi : Jawahar, 1997.

S. R. Maheswari, *Open Government in India,* New Delhi : Macmillan, 1981.

S. K. Das, *Civil Service Reform and Structural Adjustment*, Delhi : Oxford University Press, 1998.

একক-৩ ❑ বিকেন্দ্রীকরণ, ক্ষমতা হস্তান্তর ও উন্নয়ন

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ ভূমিকা
৩.৩ বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের অর্থ ও রূপ
৩.৪ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ
৩.৫ উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণ
৩.৬ সারসংক্ষেপ
৩.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী
৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে সাধারণ ধারণা গঠনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
- গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা।
- উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্ক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সম্যক ধারণা গঠনে সহায়তা করা।

৩.২ ভূমিকা

বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা, সাংবিধানিক আইন ও জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে আলোচিত। যদিও সাধারণভাবে বিকেন্দ্রীকরণকে বাঞ্ছনীয় মনে করা হয়, নানা দিক থেকে মতান্তরের অবকাশ আছে। তার পরিধি, স্বরূপ ও সীমা প্রসঙ্গে নানা পন্ডিতের নানা মত। এই মতান্তরের পিছনে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থেকে শুরু করে ঐতিহাসিকসহ নানা কারণ লক্ষ্য করা যায়।

বিকেন্দ্রীকরণ ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা যায়। ভৌগোলিক দিক থেকে সেটাকে দেখা যায়, কর্মবিন্যাসের দিক থেকে দেখা যায় আবার আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়েও আমরা আলোচনা করে থাকি। কাঠামোগত দিক থেকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণও উল্লেখযোগ্য।

মনে করা হয়, বিকেন্দ্রীকরণ গণতন্ত্রের পক্ষে অনুকূল; স্থানীয়ভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উন্নয়নের পথে সহায়ক। স্বাধীনতা-উত্তরকালে উন্নয়নশীল দেশগুলি অনেক ক্ষেত্রেই বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জাতি গঠন ও উন্নয়নের লক্ষ্যের দিকে এগোনোর চেষ্টা করে।

৩.৩ বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের অর্থ ও রূপ

বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা কেন্দ্রীকরণের ধারণার বিপরীত ধারণা। প্রশাসনিক প্রক্রিয়া হিসাবে তা উচ্চতর প্রশাসনিক স্তর থেকে নিম্নতর স্তরে আইনী, বিচারালয় সংক্রান্ত বা প্রশাসনিক ক্ষমতার হস্তান্তর বোঝায়। আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ ও কেন্দ্রীকরণের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন হয়; আবার সেই সমন্বয় কিভাবে হবে, কেমন হবে তা নিয়ে নানা জটিলতা থাকে। সংগঠনের আয়তন, কর্মীসংখ্যা, কাজের পরিধি যত বেড়ে যায় বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের তাগিদও তত বাড়ে। একটি সংগঠনের আয়তন যখন অনেকটাই বেড়ে যায় তখন অতিরিক্ত কাজের চাপ সামলাতে সংগঠন তার অভ্যন্তরে কিছু স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ গড়ে, তাদের সুনির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে কাজের দায়িত্ব বণ্টন করে। এই ভাবে একটি সংগঠনে বিকেন্দ্রীকৃত বিভাগ গড়ে ওঠে। একইভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

বিকেন্দ্রীকরণের দুটি ধরণ বা রূপ দেখা যায়। একটি হল উল্লম্ব ও ভৌগোলিক (vertical and territorial), অন্যটি হল আনুভূমিক ও কার্যগত (horizontal and functional)। প্রথমটিতে সমগ্র প্রশাসনিক ক্ষেত্রটিকে উল্লম্বভাবে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রই স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়। পক্ষান্তরে, আনুভূমিক ও কার্যগত বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি বিভাগ সমপর্যায় স্তরের প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট বিষয়ে কাজ করার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেয়; সেই প্রতিষ্ঠানগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায়।

বিকেন্দ্রীকরণের বেশ কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমতঃ, বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ভার অনেকটাই কমানো সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিটি স্তরের মধ্যে কাজের বণ্টন হওয়ায় ও তার ফলে চাপ সীমিত হওয়ায় কাজের মান উন্নততর হওয়ার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। তৃতীয়তঃ, ভৌগোলিক দিক থেকে দূরবর্তী অঞ্চলের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে জনগণের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বাড়ানো সম্ভব হয়। চতুর্থতঃ, বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে দিয়ে লাল ফিতের ফাঁস, তথা প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার জটিলতা অনেকটাই কমানো যায়। পঞ্চমতঃ, বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আলাদা আলাদা অঞ্চলের জন্য, তাদের আলাদা আলাদা ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে, আলাদা আলাদা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়। ষষ্ঠতঃ, বিকেন্দ্রীকরণ, সীমিত এলাকায় প্রশাসনিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোকে সম্ভবপর করে। সপ্তমতঃ, বিকেন্দ্রীকরণ স্বশাসনের প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র। বিখ্যাত চিন্তাবিদ Harold Laski-র মতে, বিকেন্দ্রীকরণ হল "...a training in self-government"। এবং এটি তাদেরই ক্ষমতা দেয় যারা "those who feel most directly the consequences of those powers" (Harold J. Laski, *A Grammar of Politics*, George Allen & Unwin, 1960, পৃ. ৬১)। অষ্টমতঃ, বিভিন্ন স্তরে ক্রমোচ্চ কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে বিকেন্দ্রীকরণ আমলাতান্ত্রিকতাকে হ্রাস করে। নবমতঃ, বিকেন্দ্রীকরণের ফলে সরকার ও জনগণের সব দিক থেকে যোগসূত্র জোরদার হয়। সরকারের কথা জনসাধারণের কাছে পৌঁছায়, জনসাধারণের কথা সরকারের কাছে পৌঁছায় সহজে এবং দ্রুত।

বিকেন্দ্রীকরণের কিছু সমস্যার কথা অবশ্য মাথায় রাখা দরকার। প্রথমতঃ, বিকেন্দ্রীকরণের সুফল পেতে হলে বিভিন্ন অংশের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় প্রয়োজন। সমন্বয়ের অভাব ঘটলে অযথা সংঘাত ঘটতে ও কাজের পরিবেশ নষ্ট হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে প্রতিটি অংশ বা স্তরের কাজের এক্তিয়ার সঠিকভাবে নির্দিষ্ট না

হলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তৃতীয়তঃ, স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় গোষ্ঠীদের দিক থেকে অতিরিক্ত চাপ আসতে পারে।

ক্ষমতা হস্তান্তর হল নিয়মমাফিক প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সংস্থার হাতে আইন মোতাবেক বিশেষ কিছু কাজ করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করা। H. Maddick-এর কথায় "the legal conferring of powers to discharge specified or residual functions upon formally constituted local authorities." এইভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে সংবিধান বা আইন সংশোধন না করে সে ক্ষমতা প্রত্যাহার করা যায় না।

সুষ্ঠ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য যে নীতিগুলি মেনে চলা প্রয়োজন সেগুলি হল—

(১) হস্তান্তরের বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত আকারে হওয়া দরকার।

(২) প্রতিটি স্তরের দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের সীমারেখা সুস্পষ্ট ভাবে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

(৩) ক্ষমতা হস্তান্তর সুপরিকল্পিত ও বাস্তবসম্মত হওয়া দরকার।

(৪) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নিম্নতর স্তরের আধিকারিকদের দায়বদ্ধতা সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

(৫) বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় থাকা দরকার।

(৬) সংগঠনের ভিতর উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা আবশ্যক।

৩.৪ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ

সাম্প্রতিককালে বিকেন্দ্রীকরণকে গণতন্ত্রের জন্য প্রাসঙ্গিক মনে করা হয়। বিকেন্দ্রীকরণ বললে আমরা সরাসরিভাবে গণতন্ত্রের সাথে তার যোগ দেখি না। বিকেন্দ্রীকরণ সরাসরিভাবে দেখলে বলা যায় একটি আইনি, প্রশাসনিক কাঠামোগত ব্যবস্থা। সেটির সঙ্গে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যোগ থাকতেও পারে আবার নাও পারে। তাই, আমরা আজ শুধু বিকেন্দ্রীকরণ নয়, জোর দিই গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের উপর; অর্থাৎ, 'গণতান্ত্রিক' শব্দটিকে 'বিকেন্দ্রীকরণের' সাথে যুক্ত করে দেখি। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ বললে শুধু কার্যগত বা এলাকা ভিত্তিক বিকেন্দ্রীকরণ বোঝায় না। এতে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার পূণর্বিন্যাসের একটা ছবি ফুটে ওঠে। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে উন্নয়নের লক্ষ্যে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ বোঝায়। জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা ও স্বাধিকার থাকে।

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রথম গুণ হল এটি গণতন্ত্রের পরিধিকে বিস্তৃত করে। যাদের জন্য পরিকল্পনা তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তার সাথে যুক্ত থাকে। দ্বিতীয়তঃ, এখানে ক্ষমতা যে উৎস থেকে প্রবাহিত হয় সেটিও যেমন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে সেই ক্ষমতার অংশবিশেষ হস্তান্তরিত হয় সেটিও গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত।

ক্ষমতা হস্তান্তর নানা ধরনের হ'তে পারে। তা সম্পূর্ণ বা আংশিক হতে পারে, শর্তাধীন বা নিঃশর্ত হতে পারে; আনুষ্ঠানিক বা অ-আনুষ্ঠানিক হতে পারে; আবার প্রত্যক্ষ বা মধ্যবর্তী হতে পারে।

ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কাঠামোগত বা সাংগঠনিক বাধার পাশাপাশি অনেক সময়ে ব্যক্তিগত বাধাও উঠে

আসে। সাংগঠনিক বাধার উদাহরণ হিসাবে দেখা যায় নিয়মকানুনের অভাব বা অস্পষ্টতা অথবা উপযুক্ত যোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাব। আবার, ব্যক্তিগত বাধার দিক থেকে থাকে আধিকারিকদের ব্যক্তিত্বের ধরণ, অতিমাত্রায় উচ্চাকাঙ্খা, শ্লথতা বা রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাতের সীমাবদ্ধতা।

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ যেমন কার্যকারিতার উপর জোর দেয়, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ কিন্তু আরো কিছু আনার চেষ্টা করে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ নিম্নতর আধিকারিক ও সংস্থাদের কাজের সুবিধার জন্য ক্ষমতা প্রদান করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ তার পাশাপাশি জনসাধারণকে নীতি গ্রহণ ও রূপায়ণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার অধিকার দেয়। সেদিক থেকে নিছক বিকেন্দ্রীকরণের তুলনায় গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের পরিধি ব্যাপকতর। প্রথমটায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা জনগণকে দেওয়া হয়, দ্বিতীয়টায় জনগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করা হয়।

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের স্থানীয় স্বশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, যদিও দুটি ধারণা এক নয়। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ একটি রাজনৈতিক ধারণা; স্থানীয় স্বশাসন একটি কাঠামোগত বিন্যাস ব্যবস্থা। তবে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের চেতনা অনেকটাই এই কাঠামোগত বিন্যাসের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়। যথা পঞ্চায়েত বা পৌরসংস্থার মাধ্যমে জনগণ স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন কোন পথে হবে সে বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ও ভোট প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আবার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের এটি একটি প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র। নির্বাচিত স্থানীয় সংস্থাগুলি গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর নিম্নতম স্তর।

এই স্থানীয় সরকারের সংস্থাগুলি জনসাধারণের খুব কাছের; ফলে স্থানীয় মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন উপলব্ধি করার পক্ষে বিষেভভাবে উপযুক্ত। জনসাধারণের মধ্যে যথাযথ চেতনার উন্মেষ ঘটলে গণতান্ত্রিকীকরণের পক্ষে তা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। Hugh Tinker সঠিকভাবেই বলেন, “A healthy system of local government offers almost the only method of keeping a check on the new bureaucracy created by the growth in the activities of the state.” [Hugh Tinker, *Foundations of Local Self-Government in India, Pakistan and Burma*, Bombay, ১৯৬৭, পৃ. ৩৪৬]

তবে সমস্যাও আছে। গ্রামীণ সমাজে প্রায়শই দেখা যায় ধর্ম, জাতি বা গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রবল; প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষেরা নানা অত্যাচারের শিকার। কুসংস্কারের শিকড় সমাজের অতি গভীরে প্রোথিত। এ হেন পরিস্থিতিতে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের সংস্থাগুলির মধ্যেও এর কুপ্রভাব দেখা যায়। ফলে, সঠিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেখানে উচ্চতর স্তরের হস্তক্ষেপ ও পরামর্শ প্রয়োজন হতে পারে।

আরো একটি সমস্যার দিক আছে। উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ বা রূপায়ণ করা সহজ নয়। অনেক ক্ষেত্রে বহু তথ্য সংগ্রহ করা, বিশ্লেষণ করা ও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়। এ কাজ সঠিকভাবে করতে হলে বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন হয়। বিশেষজ্ঞের সাহায্য ছাড়া এটা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই বিশেষজ্ঞ সহায়তা স্থানীয়ভাবে জোগাড় করা শক্ত, ফলে উপর থেকে সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা দরকার ‘সহায়তা’ যেন ‘নিয়ন্ত্রণ’-এ পরিণত না হয়!

কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও আজ প্রায় সবাই গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের গুরুত্ব স্বীকার করেন। বামপন্থী থেকে শুরু করে নয়া উদারনীতিবাদীরা ও পরিবেশবিদরা সবাই গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণকে সুশাসনের হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করছে।

৩.৫ উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণ

উন্নয়ন বললে আমরা সাধারণত উন্নততর এক জীবনযাত্রার মান লাভ করার কথা ভাবি। সেই পথে অগ্রসর হওয়ার দিকে তাকাই। এটি পরিবর্তন, তবে যে কোন ধরনের পরিবর্তন নয়। এই পরিবর্তনের ধারণার পিছনে বিশেষ লক্ষ্য আছে, বলা যেতে পারে একধরণের মূল্যবোধ বা দর্শন। সে দর্শন সাম্যভিত্তিক, উদারনৈতিক, গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দর্শন। ইউনাইটেড্ নেসন্স্ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বা UNDP-র মতে উন্নয়নের অর্থ হল, "to lead long and healthy lives, to be knowledgeable, to have access to the resources needed for a decent standard of living and to be able to participate in the life of the community."

উন্নয়নের ধারণা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ধারণা নয়। অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে আমরা Gross Domestic Product (GDP)-র প্রেক্ষিতে দেখি। উন্নয়নের ধারণায় কিন্তু জনগণের সার্বিক কল্যাণের ছবি ধরা পড়ে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি অবশ্যই এর একটা দিক, তবে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি হলেই যে তার সুফল সব অংশের মানুষের কাছে সমানভাবে পৌঁছবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। প্রকৃত উন্নয়নের উপাদানগুলি বিবেচনা করলে দেখা যায় সেগুলির লক্ষ্য হল—

(১) দারিদ্র্য হ্রাস করা।

(২) জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নততর করা।

(৩) দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুফল জনগণের মধ্যে সমানভাবে পৌঁছে দেওয়া।

(৪) জনসাধারণের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পাওয়া।

(৫) প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি যার ফলে উৎপাদন ও পরিষেবা বৃদ্ধি সম্ভব হবে।

(৬) মানুষের সামনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকল্পগুলির পরিধি বৃদ্ধি করা।

(৭) উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে নাগরিকদের আরো সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা।

ক্রমেই উন্নয়নের ধারণা অর্থনৈতিক পরিধি অতিক্রম করে বৃহত্তর রূপ ধারণ করে সেখানে সরকার, বাজার ও পৌর সমাজের ভূমিকা স্বীকৃত। সে উন্নয়ন 'মানবকেন্দ্রিক' সামাজিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর জোর দেয়। এই উন্নয়নের চিন্তাভাবনায় মানবাধিকার, সমাজিক ন্যায়, আইনের শাসন ও রাজনৈতিক সাম্য গুরুত্ব পায়।

স্বাধীন ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক, জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই উন্নয়ন পরিকল্পনায় একদিকে যেমন সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ দেখা যায় তেমনই অপরদিকে পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক উদারনীতিবাদ ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের সংমিশ্রণকে সেই ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়। মনে করা হয়, যথার্থ জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই উন্নয়ন জনমুখী হয়ে উঠতে পারে; কেন্দ্রীয় নির্দেশনামা, কেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠান সমূহ ও আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তা সম্ভব নয়। সেই লক্ষ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ক্রমে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, পরিকল্পনা ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তারই সঙ্গে উঠে আসে উন্নয়নকে টেকসই উন্নয়ন করার চাহিদা। অর্থাৎ, Sustainable Development-এর ধারণা।

ভারতবর্ষে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে উন্নয়ন ঘটানোর প্রচেষ্টা পঞ্চাশের দশকে শুরু হয়। সে সময়ে ভারত সরকার বলবন্ত রাই মেহতা কমিটির পঞ্চায়েতি রাজ বিষয়ক সুপারিশ গ্রহণ করে। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করার কথা বলা হয়। তাতে জেলা স্তরে জেলা পরিষদ, ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সীমিত আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা হলেও প্রতিনিধিরা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হন। ক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বিকেন্দ্রীকৃত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে উন্নততর করার লক্ষ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়। All-India Panchayat Parishad, Consultative Council on Panchayat Raj ও Central Council of Local Self-Government-এর মতো সংস্থা গঠিত হয়। মূল লক্ষ্য বিকেন্দ্রীকৃত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে উন্নত করা, সেখানে সমন্বয় ঘটানো এবং প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ব্যবস্থা করা। তবে ১৯৫৯-এ পঞ্চায়েতি রাজের সূচনা থেকে শুরু করে ১৯৭৭ পর্যন্ত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা অনেকটাই দুর্বল ছিল। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ক্ষমতার বা আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ অল্পই হয়েছিল; এ ব্যাপারে প্রশাসনিক বা সাংবিধানিক পরিবর্তনও বিশেষ দেখা যায়নি। তবে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কিছু উন্নয়ন সংস্থা স্থাপিত হয় যথা CADC, DPAP, IRDP, DRDA প্রভৃতি। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পিত ও আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পগুলি রূপায়ণ করতে পঞ্চায়েতের সঙ্গে সহযোগিতায় এই সংস্থাগুলির কাজ করার কথা।

ক্রমেই দেখা যায় যথার্থ বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী বাড়তে থাকে। এক্ষেত্রে তিনটি রিপোর্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৮-এর Committee on Panchayati Raj Institutions, ১৯৮৪-র Working Group on District Planning এবং ১৯৮৫-এর Committee to Review the Existing Administrative Arrangements for Rural Development and Poverty Alleviation Programmes (CAARD) এর রিপোর্ট।

বিভিন্ন আলাপ আলোচনার পর বিকেন্দ্রীকরণকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ১৯৯২-তে সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনী আনা হল। ৭৩তম সংশোধনী পঞ্চায়েত প্রসঙ্গে এবং ৭৪তম সংশোধনী পৌর সংস্থাগুলি প্রসঙ্গে। এই সংবিধান সংশোধনীগুলির ফলে বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষমতা বণ্টন ব্যবস্থা সাংবিধানিক মর্য্যাদা লাভ করে। গ্রামীণ স্তরে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে জনগণের হাতে স্থানীয় সম্পদ, তার ব্যবহার ও উন্নয়নমুখী কর্মসূচী গড়ে তোলার ক্ষমতা তুলে দেওয়ার প্রয়াস দেখা যায়।

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলে তারই পরিপূরক হিসাবে বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী 243ZD ধারা ও 243ZE ধারা সংবিধানে সংযোজিত করে; এর মাধ্যমে যথাক্রমে District Planning Committee (DPC) ও Metropolitan Planning Committee (MPC) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে আঞ্চলিক স্তর থেকে উঠে আসা পরিকল্পনার সঙ্গে জেলা স্তরের পরিকল্পনার সমন্বয় সাধনের কথা বলা হয়।

গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গৃহীত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা, ১৯৮৯ থেকে

প্রবর্তিত জওহর রোজগার যোজনা (JRY) রূপায়নের ক্ষেত্রে ১৯৯৩-৯৪-এ কিছু পরিবর্তন আনা হয়। এই প্রকল্পের সাথে দুটি নতুন প্রকল্প যুক্ত করা হয়। এই দুটি প্রকল্প বা Sub-scheme হল ইন্দিরা আবাস যোজনা (IAY) ও মিলিয়ন ওয়েলস্ স্কিম (MWS)।

সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধন চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রশাসন তৃণমূল স্তরের প্রান্তিক মানুষের থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন ছিল। নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে সেই সীমাবদ্ধতা কিছুটা হলেও দূর হয়। তফসিলি জাতি, জনজাতি, অন্যান্য পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণিভুক্তদের ও নারীদের উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে অনেক বেশি সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ও তা রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই জনগোষ্ঠীর মানুষেরা যুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। জনসাধারণের উন্নয়নক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ গণতান্ত্রিক শাসনের লক্ষ্যে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ; সুশাসনের দিকে এক ধাপ এগোনো। এক্ষেত্রে উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দুকে বৃহস্তর স্তর বা Macro level থেকে ক্ষুদ্র স্তর বা micro level-এ নিয়ে আসার প্রক্রিয়া চলছে। নতুন ব্যবস্থার ফলে চিরাচরিত ক্ষমতার বিন্যাস কিছুটা হলেও পরিবর্তিত হয়েছে। তবে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা এখনও থেকে গেছে। সেগুলির কথা ২০০২-এ ৬ এপ্রিল-এ অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত প্রধানদের জাতীয় কনফারেন্স-এ আলোচিত হয়। আলোচনায় উঠে আসে ১৯৯২-এর সংবিধান সংশোধনের দুর্বলতার কথা। মনে করা হয়, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের চাহিদাগুলি যথাযথভাবে পূরণ করা হয়নি। স্থানীয় স্তরে পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে মানুষের অংশগ্রহণকে আরো জোরালো করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লিখিত হয়।

৩.৬ সারসংক্ষেপ

বিকেন্দ্রীকরণ, ক্ষমতা হস্তান্তর ও উন্নয়ন একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রত্যেকটিই অপরিহার্য। তৃণমূল স্তরে জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক বিকাশ আনা তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে হলে বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তর আবশ্যক। বিকেন্দ্রীকরণ একাধারে রাজনৈতিক ও কাঠামোগত ধারণা। এর সঙ্গে স্থানীয় স্বশাসনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। নির্বাচিত স্থানীয় সংস্থাগুলি গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর নিম্নতর স্তর হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে ১৯৯২-র ৭৩-৭৪তম সংবিধান সংশোধনের মধ্যে দিয়ে উন্নয়নের জন্য বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকে বেশ কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, তবে নানা ধরনের সমস্যাও থেকে গেছে যেগুলোকে অতিক্রম করা আবশ্যক।

৩.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

(২) বিকেন্দ্রীকরণকে কি হিসাবে উন্নয়নের সহায়ক মনে করা হয় তা আলোচনা করুন।

(৩) ভারতে উন্নয়নের লক্ষে বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা আলোচনা করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) ক্ষমতা হস্তান্তর বলতে আমরা কী বুঝি?

(২) উন্নয়নের মূল লক্ষ্য কী?

(৩) গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ বলতে আমরা কী বুঝি?

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) বিকেন্দ্রীকরণের পাঁচটি সুবিধা লিখুন।

(২) ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য কাম্য নীতিগুলি লিখুন।

(৩) বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে তিনটি রিপোর্ট উল্লেখ করুন।

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

L. D. White, *Introduction to the Study of Public Administration,* New York, Macmillan, 1955

H. Maddick, *Democracy, Decentralization and Development,* Bombay : Asia Pub. 1966.

S. Mishra, *Democratic Decentralization in India* : *Study in Retrospect and Prospect*, New Delhi : Mittal, 1994.

A. Aziz and D. Arnold (eds), *Decentralized Governance in Asian Countries,* New Delhi, Sage, 1996.

P. Bardhan, 'Decentralization of Governance and Development', *Journal of Economic Perspectives,* vol. 16 (4), 2002.

James W. Fesler, *"Approaches to the Understanding of Decentralization." Journal of Politics*, XXVII, August 1965.

রাজশ্রী বসু, *জনপ্রশাসন*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৫।

Mohit Bhattacharya, *Development Administration,* New Delhi, Jawahar Publishers, 1997.

একক-৪ ❑ ভারতীয় প্রেক্ষিতে সুশাসন

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য
৪.২ ভূমিকা
৪.৩ ভারতীয় প্রেক্ষিত
৪.৪ আমলাতন্ত্রে পরিবর্তন
৪.৫ সিটিজেন্‌স্‌ চার্টার
৪.৬ স্বচ্ছ শাসন : তথ্যের অধিকার
৪.৭ ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সুশাসন
৪.৮ সারসংক্ষেপ
৪.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী
৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- ভারতীয় প্রেক্ষিতে সুশাসনের ধারণা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করা।
- স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের আমলাতন্ত্রের পরিবর্তন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা।
- সিটিজেন্‌স্‌ চার্টার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সম্যক ধারণা প্রদান করা।
- স্বচ্ছ শাসনের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে তথ্যের অধিকার বিষয়ে ধারণা প্রদান করা।
- ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অবগত করা।

৪.২ ভূমিকা

আজ জনপ্রশাসন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্ত আলাপ-আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সুশাসনের ধারণাটি উঠে আসে। মনে করা হয় উন্নয়ন পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে এটি মূল বিবেচ্য হওয়া উচিত। ১৯৯২-এ প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাঙ্ক-এর *Governance and Development*-এ Governance-এর তিনটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। প্রথমতঃ, একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে। দ্বিতীয়তঃ, এমন একটি প্রক্রিয়া হিসাবে যার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ অর্থনীতি ও সামাজিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে। তৃতীয়তঃ, সরকারের নীতি রূপায়ণ করা ও সাধারণভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করার পরিকাঠামোগত ক্ষমতা থাকা।

বর্তমানে উন্নয়ন ও সুশাসনকে একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত মনে করা হয়। বর্তমানে উন্নয়নকে কেবলমাত্র আর্থিক বৃদ্ধি হিসাবে দেখা হয় না। উন্নয়ন বলতে বোঝায় মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ থেকে শুরু করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা। আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন ব্যতিরেকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আবার, সুশাসন না থাকলে সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বিশ্বব্যাঙ্ক উন্নয়ন ও সুশাসনকে সংযুক্তভাবে দেখার পক্ষে জোরালো সওয়াল করে। এই বক্তব্য তুলে ধরা হয় তার একাধিক প্রকাশনায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *Governance : The World Bank Experience,* যেটি ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৯৭-এ প্রকাশিত *The State is a Changing World*।

৪.৩ ভারতীয় প্রেক্ষিত

সত্তরের দশকে বিশ্বব্যাপী শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে ভয়াবহ মন্দা দেখা দেয়। গোটা ইউরোপ এই মন্দার শিকার হয়। দক্ষিণপন্থী থেকে শুরু করে বামপন্থী সরকারগুলি সকলেরই টালমাটাল অবস্থা হয়। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংকটের ছায়া দেখা যায়। বৈদেশিক ঋণের বোঝা, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলির ব্যর্থতা, বেকারত্ব, ছাঁটাই, শ্রমিক অসন্তোষে দেশগুলি তোলপাড় হতে থাকে। এর ফলে রাষ্ট্রের ভূমিকার বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকক্ষেত্রেই ক্ষুণ্ণ হতে থাকলো। এহেন বৈধতার সংকটকালে সীমিত রাষ্ট্র ও মুক্ত অর্থনীতির পক্ষে সওয়াল ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রেগন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার। ক্রমেই পশ্চিমী দেশগুলি এই নীতিকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হিসাবে গ্রহণ করে। এই উদারিকরণ প্রক্রিয়া ক্রমেই বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করে। উদারিকরণনীতি গ্রহণের পক্ষে আর্থিক সঙ্কটাপন্ন দেশগুলির উপর বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক মনিটারি ফান্ডের চাপ আসে। উদারিকরণ নীতির মূল প্রতিপাদ্য ছিল সরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ কমানো, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা; প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বাড়ানো ও বাজার পরিচালনা ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীলতা বাড়ানো।

১৯৯১ সালে ভারতের নরসীমা রাও সরকারের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে নতুন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৯০-৯১ সালে ভারতের অর্থনীতি চরম সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি যথা বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আই. এম. এফ.-এর দিক থেকে অর্থনৈতিক সংস্কার মেনে নেওয়ার জন্য জোরালো চাপ আসছিল। এ হেন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নতুন অর্থনীতি সংক্রান্ত ঘোষণা হয়। পূর্ববর্তী চার দশক অনুসৃত নেহরু মডেলের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার চিন্তাভাবনার অবসান ঘটে। পশ্চিমের দেশগুলির মতই ভারত উদারীকরণ ও মুক্ত বাজারের অর্থনীতি গ্রহণ করে; কাঠামোগত সমঝোতা বা Structural Adjustment-এর ভিত্তিতে নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করে। ১৯৯২-৯৭ সালের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারের ভূমিকা ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে পূণর্মূল্যায়ন ও পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। সরকারি ক্ষেত্রের পুণর্গঠন প্রয়োজন এমনটাই মনে করা হয়। মনে করা হয়, সরকারের সঠিক কাজ হবে বেসরকারি সংস্থা, পঞ্চায়েত ও সমবায়ের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের উপযুক্ত অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা।

এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে উঠে আসে সুশাসনের বিষয়টি। ১৯৯৬-এ নভেম্বর মাসে Chief Secretary-দের কনফারেন্স্-এ বিষয়টি আলোচিত হয়। এই সম্মেলন থেকে সরকারে প্রশাসনিক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বেশ কিছু

সুপারিশ উঠে আসে। ভারতের অর্থনীতিকে বাজারমুখী করার লক্ষ্যেই এই সুপারিশগুলি করা হয়। সুশাসনের চিন্তাভাবনা তারই অংশ বিশেষ। এই সম্মেলনে উঠে আসা সিদ্ধান্তগুলি জনসাধারণের মতামতের জন্য তুলে ধরা হয়। সরকারি আধিকারিক থেকে শুরু করে, বেসরকারি সংস্থা, বিশেষজ্ঞ, নাগরিক গোষ্ঠী প্রভৃতির মতামত আহ্বান করা হয়। ১৯৯৭-এর মে মাসে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে প্রস্তাবগুলি আলোচিত হয়; সেখানে প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতারা Chief Secretary-দের প্রস্তাবগুলি সমর্থন করেন এবং একটি Action Plan গ্রহণ করেন। শুরু হয় সরকারিভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, স্বাধীন ভারতে শুরু থেকেই জাতি গঠন (nation-building) এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (ocio-economic development)-এর উপর জোর দেওয়া হয়। এমনকি স্বাধীনতার আগেও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি জাতীয় রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যে প্রায়শই উঠে আসে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার সময়ে গণপরিষদে নেহরুর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, "The first task of the Assembly is to free India through a new Constitution, to feed the starving people and clothe the naked masses, and to give every Indian fullest opportunity to develop himself according to his capacity.... If we cannot solve this problem soon, all our paper Constitutions will become useless and purposeless."

অর্থাৎ, গণপরিষদের সামনে প্রথম কাজ হল একটি নতুন সংবিধানের মাধ্যমে ভারতকে মুক্ত করা, ক্ষুধার্ত মানুষকে খাদ্য দেওয়া, নগ্ন মানুষকে আভরণ দেওয়া আর প্রতিটি ভারতীয়কে নিজের বিকাশ ঘটানোর পূর্ণ সুযোগ করে দেওয়া।...এই সমস্যার আশু সমাধান না করতে পারলে আমাদের সমস্ত কাগুজে সংবিধান ব্যর্থ হবে। তবে সংবিধান রচনার সময়ে Governance শব্দটির খুব একটা ব্যবহার ছিল না। সংবিধানের প্রস্তাবনায় শব্দটি একবারও ব্যবহৃত হয়নি। দেখা যায়, শব্দটি একবার মাত্র সংবিধানে ব্যবহৃত হয়েছে সেটি Directive Principles of State Policy-তে ৩৭নং ধরায়। সেখানে বলা হয়, "The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws."

Directive Principles of State Policy-তে উল্লিখিত নীতিগুলির মধ্যে আছে—

(১) জনসাধারণের জীবনযাত্রা নির্বাহ করার যথাযথ পদ্ধতির অধিকার।

(২) জনগোষ্ঠীর সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার এমন ভাবে বিস্তৃত হবে যাতে সর্বাধিক জনকল্যাণ সম্ভব হয়।

(৩) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত নয় যাতে সম্পদ জনস্বার্থের বিপক্ষে কুক্ষিগত হয়।

(৪) একই কাজের জন্য পুরুষ ও নারীর সমান মজুরি হওয়া।

(৫) পুরুষ ও নারী কর্মীদের স্বাস্থ্য ও ক্ষমতা ও শিশুদের বয়স যেন লাঞ্ছিত না হয় এবং আর্থিক কারণে যেন নাগরিকরা এমন পেশায় প্রবেশ করতে বাধ্য না হয় যেটা তাদের বয়স ও ক্ষমতার অনুপযুক্ত।

দেখা যায়, Directive Principles-এ শাসন প্রক্রিয়ার 'content'-এর উপর জোর দেওয়া হয়। ১৯৯৭-এ শিশুদের সুরক্ষার জন্য আরো একটি নীতি এই তালিকায় স্থান পায়। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হওয়া, তথা তৃণমূল স্তরে প্রশাসনের সঙ্গে জনসাধারণের যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে Governance-এর ধারণার বাস্তবায়ন কিছুটা হলেও অগ্রসর হয়। ১৯৭৮-এর অশোক মেহ্‌তা কমিটির সুপারিশের ফলে দেখা যায় ১৯৮০-র দশকে পঞ্চায়েতের বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। কারণ হল, পঞ্চায়েতি রাজ সংস্থাগুলিকে এবার কেবলমাত্র উন্নয়নের সংস্থা হিসাবে না রেখে রাজনৈতিক রূপ দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে, আমরা জানি, সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনের মাধ্যমে স্থানীয় স্ব-শাসন সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। তবে, সমস্যা হল, তার পরও ক্ষমতা হস্তান্তর অনেকটাই রাজ্য সরকারগুলির মর্জির উপর থেকে যায়। তবু, তার ইতিবাচক দিক হিসাবে দেখা যায় স্থানীয় পর্যায়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন দ্বারা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা বাধ্যতামূলক হয়, সরাসরি নির্বাচিত গ্রাম সভার বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্থায় গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়; নারী, তফসিলি জাতি ও জনজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে; এবং প্রতি পাঁচ বছরে রাজ্য ফাইন্যান্স কমিশন স্থানীয় সংস্থাগুলি কি ভিত্তিতে এবং কত অনুদান রাজ্যের কাছ থেকে পাবে তার সুপারিশ করে।

৪.৪ আমলাতন্ত্রে পরিবর্তন

স্বাধীনতা-উত্তর ভারত তার প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনেকটাই বৃটিশ শাসনকালের কাঠামো থেকে প্রাপ্ত হয়। ভারতে শাসন কালে ব্রিটিশ শাসকগণ তাদের উপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামো সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলেছিল। ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে শোষণ করে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করা ও দখলীকৃত দেশে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন যন্ত্রকে চিরস্থায়ী করা। ফলে, শাসন প্রক্রিয়ার মূল্য লক্ষ্য ছিল—

(১) দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

(২) রাজস্ব সংগ্রহ করা।

(৩) ব্রিটিশ আধিপত্য বজায় রাখা।

(৪) ব্রিটিশ রাজের অনুগত বিশ্বস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

দেখা যায় স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারত ব্রিটিশ প্রশাসনিক ঐতিহ্যের কাঠামোগত, সমাজতাত্ত্বিক ও কার্যগত উত্তরাধিকার অনেকটাই বহন করে। সময়ের সাথে সাথে আমলাতন্ত্রকে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা সম্পন্ন ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। কেউ কেউ তার 'ওয়েবেরিয়' বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কেউ বা তাকে জাতি ধর্ম, গোষ্ঠী, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বা বড় জমির মালিকের পক্ষপাতিত্ব করতে দেখে।

স্বাধীনতার সময়ে প্রশাসনিক পরিকাঠামো যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও দেখা যায় ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে তা নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ১৯৬৪ সালে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু মারা যান; জাতীয় অর্থনীতির হাল খুব একটা ভাল ছিল না; প্রশাসনিক দুর্নীতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং তার পাশাপাশি ছিল ব্যাপক রাজনৈতিক দুর্নীতি। এই পটভূমিতে প্রশাসনকে সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করার লক্ষ্যে Administrative Reforms Commission গঠিত হয়। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তখন প্রধানমন্ত্রী। ১৯৬৮ থেকে

১৯৭০ সালের মধ্যে এই কমিশন তার নির্ধারিত কাজ করে, ৫৮১টি প্রস্তাব সম্বলিত ১৯টি রিপোর্ট জমা দেয়। ব্যাপক সংস্কারের প্রস্তাব আনা হয়। পরবর্তীকালে প্রশাসনিক সংস্কার আনার আরো নানাবিধ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

১৯৬৯ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি 'committed bureaucracy'-র পক্ষে সওয়াল করেন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭-এর ভিতর, ইমার্জেন্সির সময়ে, উচ্চ পর্যায়ের কিছু আমলার রাজনৈতিক আনুগত্যের বিষয়টি শাহ্ কমিশনের রিপোর্ট-এ সমালোচিত হয়।

নব্বই-এর দশকের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পরে আমলাতন্ত্রে প্রথম সংস্কার আনার প্রস্তাব আসে পঞ্চম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশে। ১৯৯৬-এর এই সুপারিশে একদিকে যেমন সরকারের কাজের পরিধি ও দায়িত্ব হ্রাস করার কথা বলা হয়, অপর দিকে তেমন আমলাদের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশের মধ্যে ছিল "outsourcing"-এর সুপারিশ ও "public-private partnership"-এর সুপারিশ। মূল উদ্দেশ্য ছিল আমলাতন্ত্রকে আধিপত্যের স্থানে না রেখে সহযোগীর স্থানে নিয়ে আসা, যেখানে সরকার বাজার ও পৌর সমাজকে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কাজ করতে সাহায্য করবে। তবে, প্রশাসনিক ও আমলাতন্ত্রের সংস্কারের লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ গৃহীত হলেও রাজনৈতিক দলগুলির কাছে তা খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। প্রশাসন রাজনৈতিক নানা টানাপোড়েনের মধ্যে আটকে থেকেছে। তার বিরুদ্ধে প্রায়শই পক্ষপাতের অভিযোগ উঠেছে।

৪.৫ সিটিজেন্স্ চার্টার

নব্বই-এর দশক থেকে যে সুশাসনের ধারণা গুরুত্ব পেয়ে এসেছে, Citizen's Charter-কে তার অপরিহার্য দিক বলে মনে করা হয়। এমন একটা সময়ে যখন জনপ্রশাসনের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিল এবং সার্বিকভাবে সরকারের যোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়ছিল। Citizen's Charter-কে অনেকটাই সুরাহার পথ হিসাবে দেখা হয়।

Citizen's Charter-এর মূল বৈশিষ্ট্য হল (ক) জনপরিষেবার ক্ষেত্রে কাজের মানদন্ড প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষিত করা (খ) কর্ম প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে স্বচ্ছতা বজায় রাখা ও তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা, (গ) উপভোক্তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা ও তাদের চাহিদা সম্পর্কে জানা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাকে গুরুত্ব দেওয়া, (ঘ) সমস্ত উপভোক্তাকে সমানভাবে পরিষেবা দেওয়া। আধিকারিকদের নামের ব্যাজ পরা উচিত ও নম্র সহযোগিতার আচরণ করা উচিত; (ঙ) যদি পরিষেবা দানে কোথাও কোন ভুল হয়, দ্রুত ক্ষমা প্রার্থনা করে তা শোধরানো উচিত। অভিযোগ দায়ের করার প্রক্রিয়া, যতটা সম্ভব, সুপ্রচারিত ও সহজ হওয়া দরকার। (চ) জাতীয় সম্পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুযোগ্য পরিষেবা প্রদান করা উচিত এবং নাগরিক গোষ্ঠীর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত মানদন্ডের মাপকাঠিতে কাজের স্বাধীন মূল্যায়ন করা উচিত।

সুশাসনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। Citizen's Charter সেই লক্ষ্যেই অগ্রসর হওয়ার পদক্ষেপ। প্রতিদিন প্রশাসনের সাথে তার আদান প্রদানে নাগরিকরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় সেইগুলির মোকাবিলা করতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই Citizen's Charter-এর ধারণাটি আসে। পরিষেবা দাতা ও গ্রহিতার মধ্যে সু-সম্পর্ক স্থাপন করা তার লক্ষ্য।

ব্রিটেনে ১৯৯১ সালে প্রথম এই ধারণাটি উঠে আসে ও গৃহীত হয়। এর লক্ষ্য ছিল নাগরিক স্বার্থ মাথায় রেখে ক্রমাগত পরিষেবা উন্নততর করা। মূল উদ্দেশ্য ছিল নাগরিকদের সরকারি পরিষেবার ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন ঘটানো।

ব্রিটেনের এই প্রচেষ্টায় পৃথিবীর অনেক দেশেই আগ্রহ সঞ্চারিত হয়। এর ফলে যে রাষ্ট্রগুলি Citizen's Charter চালু করে তাদের মধ্যে ছিল অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা, স্পেন প্রভৃতি। ভারতেও ১৯৯৭-এ Citizen's Charter চালু হয়।

৪.৬ স্বচ্ছ শাসন : তথ্যের অধিকার

তথ্যের অধিকারকে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও সুশাসনের জন্য আজ অপরিহার্য্য মনে করা হয়। তথ্যের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আনা সম্ভব; আর, কেবলমাত্র প্রশাসনিক স্বচ্ছতা থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়।

১৯৯৬-এর Chief Secretary-দের সম্মেলনে স্বচ্ছতা ও তথ্যের অধিকারের সপক্ষে মত প্রকাশ করা হয়েছিল। তারা মনে করে সমস্ত সরকারী দপ্তরে স্বচ্ছতা ও তথ্য পরিষেবার এক নতুন সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তারা এও মনে করে যে সরকারে যত বেশি গোপনীয়তা থাকবে তত বেশি দুর্নীতির সম্ভাবনা থাকবে।

নব্বই-এর দশক থেকে উঠে আসা এই চিন্তা ভাবনা স্পষ্টতই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টিকোণ। ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কার্যকলাপের বিষয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখাই ছিল প্রচলিত রেওয়াজ। জনসাধারণ ও প্রচার মাধ্যমকে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে মূল বাধা ছিল ১৯২৩-এর Official Secrets Act। ১৯২৩-এর আইনটির ফলে সরকারী কর্মচারিদের কোন তথ্য প্রকাশ করাটা ছিল অপরাধ! এই আইনের ফলে সরকারি কর্মচারিরা নাগরিকদের কাছে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য অনেকাংশে গোপন রাখে।

নব্বই-এর দশক থেকে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে Official Secrets Act-এর সংশোধন আনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। সেই মত সংশোধন আনা হয়। তার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশনামা জারি করে সরকারি বিভাগগুলোর কার্যকলাপের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা আনার প্রচেষ্টা চালায়।

কম্পিউটার নির্ভর National Informatics Centre (NIC) এর মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন আরো সহজ করা হয়।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান সরাসরিভাবে জনসাধারণকে তথ্যের অধিকার না দিলেও মনে করা হয় তা প্রকারান্তরে ১৯নং (১) (ক) ধারায় দেওয়া আছে, যেখানে নাগরিকদের মত প্রকাশের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত।

তথ্যের অধিকারকে আইনি স্বীকৃতি দিতে ২০০৫-এ সংসদ তথ্যের অধিকার আইন বা Right to Information Act (RTI) পাস করে। এই আইনটির পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত, প্রশাসনের প্রায় সবটাই এর আওতায় আসে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন কোনটাই বাদ থাকে না। এই আইনের মাধ্যমে নাগরিকদের অংশগ্রহণ অনেক বেশি সফল হবে এমনটাই মনে করা হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য প্রসঙ্গে তার প্রস্তাবনায় বলা হয়

"...to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of a Central Information Commission and State Information Commission and for matters connected therewith and incidental thereto."

তথ্যের অধিকার আইনের মূল বক্তব্য হ'ল—

- নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে।
- এই 'তথ্য' বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যথা নথি, ই-মেল, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত তথ্য প্রভৃতি।
- সাধারণতঃ একজন আবেদনকারী তার আবেদন করার তিরিশ দিনের মধ্যে তথ্য পেতে পারে।
- বিশেষ ক্ষেত্রে (যদি তা জীবন-মরণ বা স্বাধীনতার প্রশ্ন হয়) ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেও তথ্য পাওয়া যায়।
- লিখিত বা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে আবেদন জমা হলে সরকারি আধিকারিক তথ্য দিতে বাধ্য।
- বিশেষ কিছু ধরনের তথ্য দেওয়া অবশ্য নিষিদ্ধ আছে।
- তথ্য চেয়ে কেউ দরখাস্ত করতে চাইলে সে দরখাস্ত না নেওয়া বা যথা সময়ের মধ্যে তথ্য না দেওয়া জরিমানাযোগ্য অপরাধ।
- কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলিকে যথাক্রমে Central Information Commission ও State Information Commission গঠন করতে বলা হয়।

উল্লিখিত ব্যবস্থার ফলে, সরকারি সংস্থায় অনেক বেশি স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা আনা সম্ভব। সে দিক থেকে বিচার করলে মানতেই হয় তথ্যের অধিকার আইন নিঃসন্দেহে সুশাসনের দিকে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

৪.৭ ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সুশাসন

নব্বই-এর দশক থেকে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে। বৈদ্যুতিক মাধ্যমে, দ্রুত, সহজভাবে, কম ব্যয়ে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়। শাসন অনেকটাই ই-শাসনের রূপ নেয়। Manuel Castells তাঁর গ্রন্থ *The Information Age : Economy, Society and Culture* (Book I)[Oxford : Blackwell, 1996]-এ লেখেন :

"As a historical trend, dominant functions and processes in the information age are increasingly organized around networks."

ই-গভর্নেন্স-এর মূল অর্থ হল কম্পিউটারের মাধ্যমে সরকারের তথ্যাদি সংরক্ষণ করা ও online পরিষেবা প্রদান করা। ভারত সরকার এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শাসনকে SMART শাসনে রূপান্তরিত করার কথা বলে। এই SMART শাসন হল Simple, Moral, Accountable, Responsive ও Transparent। অর্থাৎ, সহজ, নৈতিক,

দায়বন্ধ, সংবেদনশীল ও স্বচ্ছ। Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), International network (internet), মোবাইল ও কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে আশা করা হয় এই উন্নততর পরিষেবা সম্ভব হবে।

উনিশশো আশির দশকে ভারতে সরকারি ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার প্রথম চালু হয়। নব্বই-এর দশকে তার ব্যবহার ব্যাপকতর হয়। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে ই-গভর্নেন্স-এর বিষয়টি গুরুত্ব পায়। একদিকে যেমন তার চাহিদা উঠে আসে। অপরদিকে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় সরকারের আগ্রহও বৃদ্ধি পায়। অগ্রগতি এতই দ্রুত হয় যে দেখা যায় ২০১৪-র মধ্যে এক লক্ষ কোটি সরকারি ই-আদান প্রদান হয়। দু-একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র যেখানে নাগরিকরা online পরিষেবা পান—কেন্দ্রীয় সরকারের নির্মল ভারত অভিযান, পাসপোর্ট সেবা প্রকল্প, চণ্ডিগড়ে ই-সম্পর্ক, কর্ণাটকের ভূমি প্রকল্প, মধ্যপ্রদেশের গ্রাম সম্পর্ক। যে দপ্তরগুলির কাজকর্মের ক্ষেত্রে ই-পরিষেবা লব্ধ হয় সেগুলির মধ্যে আছে ভূমি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুলিশ, রেল।

ই-পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে নিঃসন্দেহে নাগরিকদের পরিষেবা লাভ করা অনেকটাই সহজ হয়েছে। সরকারি কোন কাজ করতে হলে নাগরিকদের আগের মত লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয় না, জটিল প্রক্রিয়ায় সময় নষ্ট করতে হয় না। কর্মচারীদের আচরণের শিকারও হতে হয় না। যেখানে যেখানে ই-পরিষেবা পাওয়া যায় সেখানে নিঃসন্দেহে শাসন অনেক বেশি স্বচ্ছ, সংবেদনশীল ও দক্ষ। তবে, সমস্যা হল সব প্রত্যন্ত গ্রামে এই পরিষেবা এখনও যথাযথ ভাবে পৌঁছয়নি।

ই-গভর্নেন্স্ নাগরিকদের ক্ষমতায়ন ও সার্বিক সুশাসনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও ভারতে এখনও বেশ কিছু সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। সেগুলির মধ্যে আছে—সবার ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের সুযোগ না থাকা, কম্পিউটার সংক্রান্ত জ্ঞান না থাকা, প্রথাগত শিক্ষার অভাব, পরিষেবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে দরিদ্র জনসাধারণের আর্থিক সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি।

৪.৮ সারসংক্ষেপ

জনপ্রশাসনের চিন্তাভাবনায় আজ সুশাসনের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সনাতন জনপ্রশাসনের চিন্তা ছিল প্রশাসনিক পরিকাঠামো কেন্দ্রিক। সুশাসনের ধারণা শাসনের ক্রিয়া নির্ভর, মূল্যভিত্তিক ধারণা। নব্বই-এর দশক থেকে বিশ্বের পরিবর্তিত আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেশে দেশে অনুভূত হয়। এই পটভূমিতে ভারতও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়ে ওঠে। এই সুশাসনের শর্ত হল ব্যাপক প্রশাসনিক পরিবর্তন যার সহায়তায় প্রশাসন, পৌর সমাজ ও বাজারের তৎপরতায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। নাগরিকরা স্বচ্ছ, দায়বন্ধ, সংবেদনশীল পরিষেবা পাবে। প্রশাসনিক নানা পরিবর্তনের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল Citizen's Charter ব্যবস্থা চালু করা, তথ্যের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বাড়ানো ও দুর্নীতির সম্ভাবনা হ্রাস করা, এবং ই-গভর্নেন্স-এর মাধ্যমে উপভোক্তাদের উন্নততর পরিষেবা প্রদান করা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও নানা আর্থ-সামাজিক সমস্যা পূর্ণ সুফল লাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৪.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) ভারতে সুশাসন সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার উদ্ভবের প্রেক্ষিত আলোচনা করুন।

(২) ভারতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা আলোচনা করুন।

(৩) তথ্যের অধিকার সুরক্ষিত করতে ভারত সরকার কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা আলোচনা করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) ১৯৯৬-এর Secretaries Conference-এর গুরুত্ব কী ছিল?

(২) Citizen's Charter-এর ধারণা সম্পর্কে লিখুন।

(৩) সুশাসন বলতে কি ধরনের শাসন বোঝায়?

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রক্রিয়ার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি ছিল?

(২) ভারতে তথ্যের অধিকারের মূল বক্তব্যগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

(৩) SMART শাসন বলতে কি বোঝেন?

৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

Mohit Bhattacharya, *New Horizons of Public Administration*, Jawahar Publishers, New Delhi, 2003.

Rumki Basu, *Public Administration : Concepts and Theories*, Sterling Publishers, New Delhi, 1994.

S. K. Chopra (ed), *Towards Good Governance,* Delhi : Konark, 1997

K. Mathur, *From Government to Governance : A Brief Survey of the Indian Experience,* Delhi : National Book Trust, 2008.

S. K. Das, *Civil Service Reform and Structural Adjustment,* New Delhi : OUP, 1998.

S. Munshi and B. P. Abraham (eds), *Good Governance, Democratic Society and Globalization,* New Delhi : Sage, 2004.

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *আধুনিক জনপ্রশাসনের রূপরেখা : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, নবোদয় পাবলিকেশনস্, কলকাতা, ২০০৪।

রাজশ্রী বসু, *জনপ্রশাসন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০৫।

পর্যায়—৪

জনপ্রশাসনের সাম্প্রতিক বিষয়সমূহ

একক-১ ☐ লিঙ্গ ও জনপ্রশাসন

একক-২ ☐ জনপ্রশাসন ও সুশীল সমাজ

একক-৩ ☐ বিশ্বায়ন ও জনপ্রশাসন

একক-৪ ☐ উদারিকরণের যুগে ভারতীয় প্রশাসন